যেটুকু জাপান

উ ৎ স র্গ

যে-বন্ধুরা জাপান নিয়ে লেখায় আন্তরিক
উৎসাহ দিয়েছেন, আগ্রহ দেখিয়েছেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লেখার সময় ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম যে পরবর্তী সংস্করণটিতে জাপানি বুদোও অর্থাৎ মার্শাল আর্ট, আর জাপানি নাট্য-ঐতিহ্য : কাবুকি, নো, কিওগেন ইত্যাদির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু ২০২৫ সালে এই দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রস্তুতির অব্যবহিত আগে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য সংবাদমাধ্যমের সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়। বিলেতের বুকার-প্রাইজ ফাউন্ডেশন ২০২২ সালে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে অপেক্ষাকৃত নবীন পাঠকদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণভাবে আপামর পাঠকদের মধ্যেই যার যার নিজের ভাষার ফিকশন পড়ার চেয়েও বিদেশি সাহিত্য থেকে অনূদিত ফিকশন পড়ার জনপ্রিয়তা তুলনায় এখন অনেক বেশি। সেই সূত্রেই আমরা জানতে পাচ্ছি যে বিদেশি নানা আন্তর্জাতিক ভাষার সাহিত্যের মধ্যে, অনুবাদে হালের জাপানি সাহিত্যের উপন্যাসগুলো

পড়ার ঝোঁক নাকি লক্ষ করার মতোই বেশি! হালের জাপানি ফিকশনের সঙ্গে বাংলাভাষী পাঠকের পরিচয় কতটা নিবিড়, নির্ণয় করা কঠিন; তবে এটুকু প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে হালের কিংবা সাবেক জাপানি ফিকশনে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনদর্শন সংক্রান্ত যে চিত্র ও বার্তা, তা কখনোই বাংলার পাঠকের কাছে খুব দূরের কিছু বলে মনে হবে না।

জাপানি গদ্যসাহিত্য জুড়ে অন্তর্লীন দর্শন ও প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনের ঐতিহাসিক যোগ আছে। সেটা আরও বেশি করে স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রসংগীতে বিস্তৃতভাবে এইসব দর্শনের অতিপরিচিত প্রকাশের নমুনা থেকে। রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে নিতান্তই বিশেষরকম সহায়তা পেয়ে বাংলার পাঠক অবশ্যই জাপানি ফিকশনের রসগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সব ভাষাগোষ্ঠীর চেয়ে অনেকটা সুবিধেজনক জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার জাপানভ্রমণের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০১৭-তে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত সেমিনারে যে বক্তব্য রেখেছিলাম, আর ২০১৮-তে কলকাতার জাপানি দূতাবাস আয়োজিত ড. ডি.এন. বক্সী স্মারক বক্তৃতায় ভারত ও জাপানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ে যা বলেছিলাম, মনে হয়েছে যে এই দুয়ের মাধ্যমে, জাপানি সাহিত্যের সম্ভাব্য বাঙালি পাঠককে খানিকটা যেন দীক্ষিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা সম্ভব। তাই এই দ্বিতীয় সংস্করণে ওই দু'টি বক্তৃতার বাংলা তর্জমা অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

প্রকাশক সংস্থা *বেঙ্গলবুকস*-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রকাশনার ক্ষেত্রে খুব অল্প সময়ে এক বিশিষ্ট নাম হয়ে

ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাঠকেরা যে এই বইয়ের কথা জানতে পারবেন, পড়তে আগ্রহী হবেন, এ বড়ো কম প্রাপ্তি নয়। সেই সূত্রে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই জনাব আজহার ফরহাদের নাম, এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ওঁর আগ্রহ আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তার সঙ্গে পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব শেখ মাহমুদ ইসলাম মিজুর ভূমিকাও অবশ্যই উল্লেখ্য, তাঁর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অভিজিৎ মুখার্জি
কলকাতা, জুলাই ২০২৫

লেখকের কথা

জাপানি ভাষা শেখার ব্যবস্থা যা হোক খানিকটা থাকলেও কলকাতায় জাপানি সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল নিরসনের ব্যবস্থা একান্তই অপ্রতুল। পাকাপাকিভাবে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বাস করছেন এমন জাপানির সংখ্যাই বা কত? ভাষাটা খানিকটা শিখেছিলাম নেহাতই 'কঠিন বিষয়ের চর্চা' করার খেয়াল থেকে, কিন্তু তারপর একবার পড়াতে গেলাম কানাজাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটাই ঠিক করে দিল যে দেশটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা আরও গভীর হবে। ফিরে এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল্যাংগুয়েজে জাপানি শেখানোর একটা ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে পেরেছিলাম। তারপর তো সেই সূত্রে জাপান ফাউন্ডেশনের দাক্ষিণ্যে বেশ ক-বার একেবারে জাপানে গিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ মিলল। এছাড়াও নানা পেশাগত যোগসূত্রে, অনুবাদক ও দোভাষির কাজ করে জাপানি মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সেটা আমার

পরম প্রাপ্তি। খেয়াল করলাম, খুবই বিদ্বান ও অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের লেখা পড়ে জাপানের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে ধারণাগুলো হয় আর সরাসরি সংযোগে যে পরিচয় পাওয়া যায়, আজও সে দুটোর মধ্যে বহু ফারাক। পত্রপত্রিকা থেকে অনুরোধ এলেই তাই সময় করে নিয়ে লিখেছি নানা বিষয়ে এবং এর মধ্যে বহুবারই কোনো বিশেষ বইয়ের রিভিউ করার ধাঁচায়। এ বইয়ে রয়েছে ইউকিও মিশিমার একটি উপন্যাস থেকে একটি ছোট অংশের অনুবাদ। ১৯৬৮-তে নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়ে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা তাঁর বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন—জাপানি সংস্কৃতিতে মৃত্যুচেতনার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক কত গভীর! ইউকিও মিশিমার এই অংশটিতেও তার পরিচয় বোধ হয় অনেকটা পাওয়া যাবে। ভাষা জানা না থাকলে অনেক সময়ই বোধের সূক্ষ্মতা জিনিসটার নাগাল পাওয়া যায় না। এখানে বাংলা অনুবাদে সেটা আনতে পারলাম কি না, কে জানে!

জাপানি সংস্কৃতির অন্তত আরও দুটো সর্বজনবিদিত দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এ বইতে আপাতত গেল না—জাপানি বুদোও অর্থাৎ মার্শাল আর্ট আর জাপানি নাট্য-ঐতিহ্য, কাবুকি, নো, কিওগেন ইত্যাদি। দেখি, পরের সংস্করণের আগে প্রস্তুত হতে পারি কি না।

কলকাতায় জাপানি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ও জাপানোলজি চর্চায় যিনি প্রধান পুরুষ, সেই ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্সীর প্রতি কলকাতায় যাঁরা জাপানি শিখেছেন, তাঁরা চিরকৃতজ্ঞ। জাপানি ধর্মতত্ত্বের ওপর ওঁর মান্য গবেষণাও আছে।

মুখবন্ধ

নিজেকে জানতে গেলে অন্যকেও জানতে হয়। খুব বাইরের দিক থেকেও কথাটার একটা মানে আছে। ধরা যাক, ব্যক্তি হিসেবেই আমি লম্বা না বেঁটে, এটুকু কথা জানতে গেলেও বা বুঝতে গেলেও আমাকে অনেকটাই অন্য কথা জানতে হয়। মানুষ মোটামুটি কতটা লম্বা হয়, আমি যে জনগোষ্ঠীর মানুষ, সেই গোষ্ঠীতে সাধারণত মানুষের উচ্চতা কতটা হয়, এই রকমের খোঁজখবর কিছুটা না নিয়ে সত্যিই তো হঠাৎ বলা যায় না একজন নির্দিষ্ট মানুষ লম্বা না বেঁটে। তেমনি একটা দেশের বেলাতেও চট করে কি বলা যায়, দেশটা ছোট না বড়। এই যে আমরা বলি, ব্রাজিল, চীন, রাশিয়া ইত্যাদি খুব বড় দেশ, সে তো অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করেই বলি। মানচিত্রটা আমরা নিশ্চয়ই হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াই না, কিন্তু ওই সব কথা বলার সময়ে মানচিত্রের খেয়ালটা আমার মাথার মধ্যে থেকেই যায়। না হলে কথাগুলোর খুব

পাশ্চাত্য বলছি, তার মধ্যেও আছে অনেক দেশ, অনেক জনগোষ্ঠী, অনেক সংস্কৃতি। তাদের সবকিছু আবার নিশ্চয়ই একেবারে এক নয়। তাহলে সেখানেও তুলনা করে বিচার-বিবেচনার দরকার আছে, কতটুকুকে আমরা বলতে পারি প্রাচ্যের ভাব আর কতটুকুই-বা পাশ্চাত্যের ভাব।

এই যে বলছি প্রাচ্যের ভাব বা পাশ্চাত্যের ভাব, এ একটা সত্তাস্বরূপের প্রশ্ন। সে প্রশ্নে গেলে আবার আর-এক রকমের তুলনা জরুরি হয়ে পড়ে। ধরা যাক, ব্যক্তিস্তরে আমার সত্তাস্বরূপ কী? ধরা যাক, এ সম্বন্ধে আমার যা-হোক কিছু একটা ধারণা আছে। তা হয়তো কোনো নির্দিষ্ট একটাই ধারণা না হতেই পারে। বেশ কয়েকটি ধারণার সমবায়, এই হয়তো আমার সত্তাস্বরূপ। একটু বাইরের স্তর থেকে বলতে গেলে এ হয়তো আমার আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। আমার ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস ও বোধ, হয়তো অনুভব ইত্যাদি অনেক কিছুই এই আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন মাত্রা হিসেবে দেখা দিতে পারে। এ সবই আমার সত্তাস্বরূপের এক-একটা দিক হতেই পারে। এই বাইরের স্তরটা ছেড়ে আরও একটু ভিতরের স্তরে সরে গেলে হয়তো দেখব, এসবেরও অন্তরালে আছে আরও কিছু আর তা হয়তো আরও একটু নিহিত অর্থে আমারই সত্তা বটে। আমি কেমনভাবে দেখছি আমাকে, এ সবই তার কথা। কিন্তু এই সত্তার প্রশ্নে আরও একটা দিক হিসেবে নিতেই হবে। আমি অন্যের চোখে কী ও কেমন, এ বিচার বাদ দিয়ে আমার সত্তাবিচার অসম্পূর্ণ। আমি নিজেকে দয়ালু ভাবলেই তো সবটুকু মিটে যায় না, অন্যের

চোখে আমি হয়তো যথেষ্ট নির্দয়। আমি যাদের মঙ্গল চাই, তা হয়তো খুব করেই চাই। এমনকি আমার সেই প্রিয়জনদের মঙ্গল চাইতে গিয়ে অন্যদের অমঙ্গলেও আমি হয়তো পিছপা হব না। সে-ক্ষেত্রে সেই অন্যদের চোখে আমি তো তাদের মঙ্গলকামী নই। অর্থাৎ সত্তাগত স্তরে আমি মঙ্গলকামী কি না, তার একমাত্রিক উত্তর সম্ভব হচ্ছে না। এবং নিজেকে আমি কী চোখে দেখি, তার সঙ্গে একইভাবে হিসেব নিতে হবে অন্যেরা আমাকে কী চোখে দেখে। এখানে বিচারের ঠিক-ভুল খুব বড় কথা নয়। ধারণাগতভাবে আমি যেমন আমাতেই সম্পূর্ণ নই, তেমনি আমার বিচারও ঠিক আমার বিচারেই সম্পূর্ণ নয়।

কথাটা জাতিগত স্তরেও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। যেকোনো সমষ্টির স্তরেও কথাটি প্রাসঙ্গিক। আমরা এমন অনেক দেশের কথা জানি, যারা নিজেদের মনে করে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপ্রিয়। তাদের ঘোষিত অবস্থান অন্য দেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানো। কিন্তু নানা ছুতোয় ও অজুহাতে অন্য দেশের উপর বেমালুম আক্রমণে তাদের তেমন দ্বিধা দেখা যায় না। ইদানীং আন্তর্জাতিকতার নামে সার্বভৌমিকতার উপরে আঘাত আসছে অহরহ। কাজেই জাতি হিসেবে আমি কেমন, এ প্রশ্ন শুধু আমি আমাকে নিয়ে কী ভাবি, তা দিয়ে আর বিচার করা যাবে না। অন্যের দৃষ্টিতে আমি কেমন, সে কথা বিবেচনা করাও একান্ত জরুরি। ফলে জাতি হিসেবে আমার সত্তাস্বরূপ শুধু আমার হাতে কখনোই পূর্ণতা পাবে না। অন্যের চোখও আমার আমাকে নির্মাণ করে বইকি! আমাদের সম্প্রদায়গত

জীবন ও গোষ্ঠীজীবনে আমরা দু'বেলা এ প্রশ্নের মুখোমুখি হই। সম্প্রদায়ের গড়নটা হতে পারে ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে বা আরও অন্য অনেক কিছুর ভিত্তিতে। কিন্তু সম্প্রদায়ের স্বরূপটা কী, তার জন্য আমাকে অন্যের মুখের দিকে তাকাতেই হবে। সেখানে থাকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, আবছা আতঙ্ক আর আরও কত কী! এবং এসব প্রশ্নের সবটুকু কিছুতেই শুধু তথ্যের স্তরে ফয়সালা করা যাবে না। ইতিহাস, সংস্কার, পরম্পরা কত কী জড়িয়ে জটপাকানো থাকে এসব সমাজ-অবস্থানে। আমাদের জীবনে আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাই বইকি!

তাই অন্যকে জানতে হয়। শুধু নিজেকে নিয়ে থাকলে চলে না। আধুনিক মানুষের তো তা একেবারেই চলে না। তার চলাচল কত বেশি, কত তার আদানপ্রদান। দেওয়া-নেওয়ার পথে পথে বদলাতে বদলাতে তার হয়ে ওঠা। সে একদিন ছিল, যখন আমরা পরস্পরকে জানতে পেতাম খুব কম। দূর তখন সত্যিই ছিল দূরে। আর জানতে চাইবার আগ্রহও তখন খুব জোরালো ছিল না। এই অপরিচয়ের আড়ালে জমে উঠেছিল নানা সংস্কার। আর স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্ন তো ছিলই। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' এমনি ধরনেরই এক ধারণা। জানাশোনার অনাগ্রহ আর স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনা—দুইয়ে মিলে এরকম কত আজগুবি ধারণাই তৈরি হতে পারে। আমাদের চারপাশে তার অনেক নজির ছড়ানো আছে।

অন্য মানুষ, অন্য জনগোষ্ঠী, অন্য দেশ, অন্য সংস্কৃতিকে জানবার এক প্রধান উপায় সেই অন্য ভাষার চর্চা। এ ব্যাপারে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে

অনটনের চেহারা এখনও বড় পীড়াদায়ক। সাধারণভাবে বিদেশি ভাষা বলতে আমাদের উচ্চশিক্ষিতের সম্বল এখনও সেই ইংরেজি। আমাদের কারও শিক্ষার পথে স্বাভাবিকভাবে অন্য কোনো বিদেশি ভাষা আয়ত্তে এসে যাবে, সে সম্ভাবনা খুব কম। কোনো-না-কোনো বিদেশি ভাষা রপ্ত করেছেন, আমাদের মধ্যে এমন অনেকে নিশ্চয় আছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যমের ফল। এবং এরকম একান্ত চর্চায় তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ভাষার অনেক ভিতর পর্যন্তও পৌঁছোতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি তাঁদের এই উদ্যম ও অনুশীলনের কাছে অবশ্যই ঋণী। কিন্তু বিদেশি ভাষাচর্চার ব্যাপারে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক মন এখনও অনেক পিছিয়ে। কাজেই তার আয়োজনও অপ্রতুল।

এছাড়াও আছে আর-এক সমস্যা। আমাদের উপনিবেশপুষ্ট মনে এমন একটা ধারণা আছে যে, ইংরেজি ভাষা দখলে থাকলেই বুঝি আমাদের সব কাজ চলে যাবে। অনেক কাজ হয়তো যাবে, কিন্তু সব কাজ যাবে না। এ ধারণা আরও একটা কারণে বিপজ্জনক। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর নানা সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা যা পাব, তা তো ইংরেজের চোখ দিয়ে দেখা জিনিসই। আর আমাদের কোনো দেখাই তো একেবারে নিরপরাধ নৈর্ব্যক্তিক নয়। আর ইতিহাসের মোচড়ে যে কত কী ঘটে! ইংরেজ একদিন সাম্রাজ্যশক্তিতে অনেকের চেয়ে বলীয়ান ছিল। কাজেই সেই ইংরেজ দৃষ্টি কি আর পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক? আমরা শুধু ইংরেজি ভাষানির্ভর হয়ে সবার দিকে তাকাতে গেলে অজান্তে ভুলের ও অন্যায়ের

ফাঁদে জড়িয়ে যাব। আমাদের অনেকের বেলাতেই সে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। উপনিবেশের যে ভূত একদিন আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল, তা অত সহজে নামবার নয়। যথেষ্ট সাবধান থাকলেও বিপদ সহজে কাটে না আর অসাবধান হলে তো কথাই নেই।

অজানার দিকে এগোতে গেলে এমনিতেই ঝোঁক থাকে নিজের মাপে মেপে নেবার। তাতে পদে পদে ভুলের আশঙ্কা। অপরিচিতের দিকে এগোতে গেলে তাই মনটা আগে থেকে একটু সহিষ্ণু করে নিতে হয়। সবার সবকিছু আমাদের মতো হবে কেন? আর আমাদের মতো না হলেই তা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্টই বা হবে কেন? কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমন হয়। সে আমাদের সংস্কার। বিদেশি ভাষা শিক্ষা, সে ভাষায় অন্য সংস্কৃতি, অন্য জনজীবন, অন্য সাহিত্যের চর্চা আমাদের সেই সংস্কারে খানিকটা পরিমাণে চিকিৎসার কাজ করতে পারে।

অভিজিৎ মুখার্জির জাপানবিষয়ক এই লেখাগুলিতে সেরকম চিকিৎসার উপকরণ আছে। জাপান আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত কোনো ব্যাপার নয়, তা ঠিক। তবে আবার খুব যে পরিচিত, তাও না। একটু হাইকু, একটু নো—এসব আমরা শুনে থাকি। তবে পরিচয় কোনো অর্থেই যে গভীর, তা বলা যাবে না। কুরোসাওয়াও এখানে খুব আদৃত নাম। রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম বক্তৃতামালা বা নোগুচির চিঠি, এসব কথা আমাদের চর্চায় কিছুটা নিশ্চয়ই থাকে। আর এশীয় শক্তি হিসেবে জাপান নিয়ে এক ধরনের একটা আহ্লাদের রীতিও এখানে চালু আছে। জাপানি সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি

সূ চি প ত্র

সামুরাই সুষমা ২৩

হাইকু ৩২

জাপানি ভাষায় জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’
উরুওয়াশি নো বেংগারু ৪৭

জাপানি কবিতাগুচ্ছ [মাসায়ুকি উসুদা] ৫৫

জাপান যাত্রায় আলোকপ্রাপ্তি : বুদ্ধদেব বসু ৫৮

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান সফর—সেই প্রথম
দর্শনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কিছু কথা ৭০

সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখায়
[ইউকিও মিশিমা] ৯১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপানযাত্রার আগে,
এবং কয়েক দশক পরে ৯৫

আরাধ্যের পুনরুত্থান আমরাই ঘটাব ১০৯

পরিবেশচেতনা—সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ১৩৭

সামুরাই সুষমা

অস্কার-টস্কার পাওয়া একটা হলিউডি সিনেমা *মেমোয়ার্স অব এ গেইশা* জাপানে দেখানো নিয়ে বেশ একটু ঝামেলা হয়েছে। জাপানি দর্শকদের আপত্তির কারণ নাকি সিনেমার মুখ্য ভূমিকায় এক গেইশার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একজন চিনে অভিনেত্রী জিই ঝাং-এর নির্বাচন। সত্যিই তো! চিরকাল সবাই জেনে এসেছে যে গেইশা ব্যাপারটা হল জাপানের, অথচ তাতে একজন চিনে অভিনেত্রী এসে পড়বে কেন? তবে ইতিহাস বলছে, গেইশাদের প্রসাধনরীতি, চুল বাঁধার বিশেষ ধরন, তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র 'শামিসেন' এগুলো সবই কিন্তু জাপানে এসেছিল চিন থেকে, মুখ্যত সেখানকার 'তাং' শাসনকালে।

অভিজাতবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য সপ্তম শতাব্দী থেকে 'সাবুরুকো' ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে 'শিরাবিয়োশি' নামে অভিহিত মহিলাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এরাই ভিন্ন নামে গেইশা প্রথার প্রাচীনতম সংস্করণ। আবার গল্প আছে যে, একাদশ শতকে দুই অভিজাতবংশীয়া মহিলা যোদ্ধবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য একরকম নতুন নাচের পত্তন করেন। রাজসভায় যোদ্ধারা যে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত, তার অনুকরণে এঁদেরও পোশাক হত সাদা রঙের। লম্বা টুপি, দীর্ঘ সাদা গাউন এবং কোমরে থাকত তরবারি। এই বিশেষ নাচটি সমাদৃত হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টুপির রং বদলে হয় কালো আর স্কার্টের রং লাল। তারপর একসময় এই নাচে টুপি ও তরবারির ব্যবহার

লুপ্ত হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, সেই দুই মহিলার থেকেই গেইশা প্রথার গোড়াপত্তন।

একটা আশ্চর্যের বিষয় হল, বাইরের পৃথিবীতে জাপানের 'গেইশা' প্রথা সুবিদিত হলেও অধিকাংশ জাপানি অভিধানে কিন্তু শব্দটি পাওয়া যাবে না। যেসব অভিধানে পাওয়া যায়, সেখানেও পরিষ্কার ইঙ্গিত থাকে যে, শব্দটি ব্যবহার করে একমাত্র বিদেশিরাই। অর্থাৎ প্রথাটি জাপানে পরিচিত অন্য কোনো নামে। এর একটি কারণ হতে পারে, প্রথাটির বিবর্তন হয়েছে লম্বা সময় ধরে, ধাপে ধাপে। যে রূপে গেইশা প্রথাটি এখনও চালু এবং যার চূড়ান্ত সমৃদ্ধি হয়েছিল সম্ভবত গত শতকের তিরিশের দশক নাগাদ, তার নৈতিক ভিত্তিতে আছে জাপানের সমাজে নারীদের স্বাধীনভাবে নান্দনিকতাচর্চার তাগিদ এবং 'এদো' যুগে নতুন করে কনফুসীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা।

গেন্‌জি মোনোগাতারি নামে কাহিনিমূলক গদ্যরচনার যে প্রাচীন নিদর্শন জাপানি সাহিত্যে বিখ্যাত, সেটি লেখা সমাপ্ত হয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ে। লেখিকা ছিলেন মুরাসাকি শিকিবু। এঁর বাবা ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। অল্পবয়সে বিধবা মুরাসাকিকে উনি পাঠান প্রধানমন্ত্রী মিচিনাগা-র কন্যা, সম্রাজ্ঞী আকিকো-র সহচরী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে। ফলে সম্রাটের প্রাসাদেই কাটাতে হয় মুরাসাকিকে। কিন্তু আকিকো-নির্দেশিত কঠোর নিয়মকানুনের জীবনে হাঁপিয়ে উঠছিলেন তিনি। ডায়েরি লিখতেন নিয়মিত, সেটাই গেন্‌জি-র কাহিনির উৎসস্থল। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে : মুরাসাকি একসময় ভাবতে থাকেন যে, ওঁর বাবা যদি ওঁকে সম্রাটের আত্মীয়া রাজকুমারী সেনশি-র অতি পরিশীলিত ও খোলামেলা আচরণের সহচরীদের একজন করে পাঠাতেন, তবেই সবচেয়ে ভালো হত। মুরাসাকি লিখছেন, রাজকুমারী সেনশি এবং তাঁর সহচরী নারীরা কেবলই হয় বেরিয়ে পড়ছে সূর্যাস্ত দেখতে কিংবা খুব ভোরে চাঁদ কেমনভাবে স্তিমিত হয়ে আসে, সেই দৃশ্যের টানে, নতুবা

পিছু নিচ্ছে পুষ্পিত বৃক্ষের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পালিয়ে বেড়ানো কোনো নাইটিঙ্গেল পাখির। রাজকুমারী নিজে এক অতি স্বতন্ত্র চরিত্রের মহিলা, আপন অভিরুচিমতো চলতে ইনি দৃঢ়সংকল্পা, রাজপ্রাসাদে থাকাকালীন ততটাই নিস্পৃহভাব বজায় রাখতে পারেন, যেমনটা এখন এই কামো মন্দিরে থাকাকালীন। যে অবস্থায় মুরাসাকিকে কাটাতে হচ্ছিল, তার থেকে অনেক অন্যরকম। চিরকালের প্রাসাদের পরিবেশ হল : 'রাজকুমারীর আবির্ভাবের সময় হল, তোমার তলব হয়েছে তাঁর সন্নিকটে' কিংবা 'মহানুভব প্রধানমন্ত্রী আবির্ভূত হবেন যেকোনো সময়ে, তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হও।' রাজকুমারী সেনশি-র মহলে এরকম যখন-তখন হুটহাট কারও উদয় হওয়ার আর সন্ত্রস্ত করে তোলার মতো আবহাওয়া নয়। যেটা করতে ইচ্ছে করে আর করার মতো এলেমও আছে, সেই জিনিসটা মন দিয়ে, মগ্ন হয়ে করা যায়। প্রাসাদে যেসব আবোলতাবোল কথায় এত কষ্ট পেতে হয় তা-তে সময় ব্যয় না করে সুন্দর একটা কিছুতে ব্যস্ত থাকা যায়। মাটিতে একটা গাছের গুঁড়ি যেমন, তেমনই নিশ্চিতভাবে নিজের চিন্তায় ডুবে থাকার উপায় আছে। তার সঙ্গে, যেসব পুরুষের সাথে পূর্বপরিচয় নেই, তাদের সবার থেকে লুকিয়ে বেড়াবার বাধ্যবাধকতাও নেই।

পুরো জাতিটাই নান্দনিকতা বা এস্থেটিকস ও আর্টের ব্যাপারে অসম্ভব সংবেদী। তাহলে তাদের নারীদেরও কি অধিকার থাকবে শিল্পচর্চায় ডুবে থেকে স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বী জীবন কাটানোর? দেখা যাচ্ছে সেই ত্রয়োদশ শতকেই স্পষ্টভাবে এই চাহিদা অভিব্যক্তি পাচ্ছে সাহিত্যে। নারী ও শিল্পসুষমার চর্চার মধ্যে একটা সম্পর্ক জাপানি পৌরাণিক মিথ-এও আছে। সাতজন সৌভাগ্যের দেবদেবীর শেষজন হলেন বেন্‌তেন্‌। এঁর সঙ্গে যেন সমুদ্রের কী একটা যোগ আছে—এঁর অধিকাংশ মন্দিরই হয় সমুদ্রের পাড়ে, নয় কোনো দ্বীপে এবং প্রতিকৃতিতে ইনি সাধারণত ড্রাগন অথবা কোনো সামুদ্রিক সরীসৃপ-এ আসীন (হয়তো চিনের সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কের এগুলোই সূত্র)। বেন্‌তেন্‌ হলেন কমনীয় নারীত্ব ও আর্টে